

রাসসুন্দরীদেবীর চিন্তনে নারীবাদ

শর্মিষ্ঠা ঘোষ

সারসংক্ষেপ :

উনবিংশ শতকে মধ্যভাগে বাংলা ভাষায় প্রথম আত্মজীবনী প্রকাশিত হয়, রচয়িতা রাসসুন্দরী দেবী। এর পূর্বে যার কোন রচনা দেখতে পাওয়া যায় নি। ফলত সাহিত্য জগতে একেবারেই অপরিচিত গ্রাম্য আদর্শ গৃহিনী নারী হলেন রাসসুন্দরী দেবী। তাঁর রচিত আত্মজীবনী হল “আমার জীবন”। তাঁর জন্ম ১৮১০ খ্রীস্টাব্দে, সে সময় বাংলার নারীদের পড়ালেখা সমাজলজ্জণকারী কাজ বলেই গৃহীত হতো। ২৬ বছর বয়সে, ১৮৩৬ খ্রীস্টাব্দে তিনি নিজ চেষ্টায় পরিবারের সকলের অলক্ষ্যে পড়তে শেখেন। ১২জন সন্তানের জননী হয়েও ৫৪ বছর বয়স, ১৮৫৪ সালে তিনি লিখতে শেখেন। আশ্চর্যের বিষয় হল এর ৩/৪ বছরের মধ্যে তিনি আত্মজীবনী লেখা শুরু করেন। বাংলা ভাষাতে প্রকাশিত প্রথম আত্মজীবনী হওয়ার জন্য, রাসসুন্দরী দেবীর অন্য কোন আত্মজীবনী দৃষ্টান্ত দেখে অনুপ্রাণিত হবার কথা নয়। আর বাংলা ভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষা পড়া বা চর্চা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না, তাই এর পূর্বে ইংরেজি বা অন্য কোন ভাষাতে কোন আত্মজীবনী রচনা হয়ে থাকলেও তা রাসসুন্দরী দেবীর জানার বিষয় নয়। তবে হঠাৎ কেন, কি উদ্দেশ্যে রাসসুন্দরী দেবীর এই আত্মজীবনী রচনা? স্বামী, সন্তান, নিজের পরিবার ও নিজের কষ্টের কথা বলাই কি উদ্দেশ্য? “আমার জীবন” স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কের বা স্বশুরবাড়ির মানুষজনদের বা পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি বা সন্তানদের কার্যকলাপ বর্ণনা নয়। তবে কি উদ্দেশ্যে এই আত্মজীবনী লেখা? কি বলতে চাইছেন লেখিকা এখানে? এই প্রশ্নটি বারবার এসে পড়ে।

এই উদ্দেশ্য অন্বেষণ করতে গেলেই উনবিংশ শতকের এক নারীর উত্তরণের চিত্র পাওয়া যায়। যিনি ধর্মকে সামনে রেখে তৎকালীন সমাজে নারীর অবমাননা, বঞ্চনার বিরুদ্ধে নীরবে, শাস্ত চিন্তে একের পর এক সমাজলজ্জণকারী কাজের মধ্যে দিয়ে প্রতিবাদ করেছেন। সব প্রতিবাদের ভাষা হয় না, অব্যক্ত প্রতিবাদ, না-বলা কথাগুলোরও অনেক কিছু বলে যায়। তাই তো আজ একবিংশ শতকেও তাঁর রচনা নিয়ে গবেষণা চলছে, এখানেই হয়তো তাঁর রচনার সার্থকতা পাওয়া যায়। ‘রাসসুন্দরীদেবীর চিন্তনে নারীবাদ’ প্রবন্ধে রাসসুন্দরী দেবীর আত্মজীবনী ‘আমার জীবন’-এ নারীর যে উত্তরণের কথা, আক্ষেপের কথা এবং অব্যক্ত প্রতিবাদের কথা পাওয়া যায়, তার মধ্যে কি বর্তমান সময়ের নারীবাদী চিন্তার কন সাযুজ্য আছে? —তাই অন্বেষণ করবো।

মূলশব্দ : নারীবাদ, স্বাধীনতা, স্ত্রীশিক্ষা, বঞ্চনা, জিতাক্ষর প্রমুখ

ভূমিকা :

“বুদ্ধির বিষয়, স্ত্রীলোকের বুদ্ধির পরীক্ষা কোন কালে লইয়াছেন, যে অনায়াসেই তাহারদিগকে অল্প বুদ্ধি কহেন? কারণ বিদ্যা শিক্ষা এবং জ্ঞান শিক্ষা দিলে পরে ব্যক্তি যদি অনুভব ও গ্রহণ করিতে না পারে, তখন তাহাকে অল্প বুদ্ধি

কহা সম্ভব হয়; আপনারা বিদ্যা শিক্ষা জ্ঞানোপদেশে স্ত্রীলোককে প্রায় দেন নাই, তবে তাহারা বুদ্ধিহীন হয় ইহা কি রূপে নিশ্চয় করেন? বরঞ্চ লীলাবতী, ভানুমতী, কর্ণাট রাজার পত্নী, কালীদাসের পত্নী প্রভৃতি যাহাকে যাহাকে বিদ্যাভ্যাস করাইয়াছিলেন, তাহারা সর্বশাস্ত্রের পারগ রূপে বিখ্যাত আছে।”^১ ঊনবিংশ শতকে বাংলার নারীরা পরিবারের সকলের সেবা ও ধর্মীয় কর্ম ব্যতিরেকে অন্যান্য সকল সামাজিক অধিকার থেকেই বঞ্চিত ছিলেন। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে ঊনবিংশ শতকে নারী জাগরণের স্রোত বাংলাতে প্রবেশ করে। সামান্য কিছু সচেতন মানুষ স্বীকার করে নেয় যে, জ্ঞানান্বেষণের ক্ষেত্রে নারীরও সমান অধিকার আছে। ইয়ং বেঙ্গল, ব্রাহ্মসমাজের সদস্যরা নারী স্বাধীনতা বিশেষ করে স্ত্রীশিক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন। সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রেও নারীরা এগিয়ে আসতে আরম্ভ করেন। নারীদের সাহিত্য চর্চার জন্য বামাবোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হয় ১৮৬৩ সালের আগস্ট মাসে। “সম্ভবত এ পত্রিকাতেই প্রথমবারের মতো স্ত্রী-স্বাধীনতা শব্দটি ব্যবহৃত হয়। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ১৮৬৬ সালে ধর্মতত্ত্বে প্রকাশিত একটি রচনায় এবং সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঐ দশকের শেষে স্ত্রী-স্বাধীনতা নামক পুস্তিকায় মেয়েদের স্বাধীনতা নিয়ে আলোচনা করেন এবং নারীমুক্তির আহ্বান জানান।”^২ নারীজাগরণের এই সকল চিত্র মূলত শহরাঞ্চল কলকাতা বেষ্টিত ছিল। কিন্তু কলকাতা শহরাঞ্চল থেকে দূরে প্রত্যন্ত গ্রামে নারী রাসসুন্দরী দেবী এই ঊনবিংশ শতকেই এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটান, তিনি ৬০ বছর বয়সে (প্রকাশকাল ১৮৭২) আত্মজীবনী রচনা করেন। এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় রাসসুন্দরী দেবীর এর পূর্বে আর কোন সাহিত্য রচনা পাওয়া যায় না। বাংলা ভাষাতে প্রকাশিত প্রথম আত্মজীবনী ‘আমার জীবন’ই তাঁর প্রথম ও শেষ সৃষ্টি।

সরলাবালা সরকার নিজের পিতামহী সম্পর্কে ‘হারানো অতীত’-এ বলেছেন, “আমার পিতামহী রাসসুন্দরী দেবী ‘আমার জীবন’ নামে একখানি আত্মজীবনচরিত লিখিয়াছিলেন। বিদ্বজ্জন সমাজে পুস্তকখানির বিশেষ সমাদর হইয়াছিল এবং তাহার কয়েক পরিচ্ছাদ ইউনিভার্সিটির আই.এ. ক্লাসে পাঠ্যরূপে গৃহীত হইয়াছিল।”^৩ ‘আমার জীবন’ এখনও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিভাগের সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত। রাসসুন্দরী দেবী ১২জন সন্তানের মা হয়ে, গৃহের সকল কর্ম সম্পন্ন করে পালিকা মূর্তিকে ত্যাগ না করে তত্ত্বসৃষ্টিতে অংশ গ্রহণ করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। এখন প্রশ্ন হল ৬০ বছর বয়সে অন্য কোন সাহিত্য রচনা না করে আত্মজীবনী রচনার কারণ কি? কি উদ্দেশ্যে এই রচনা? নিছক প্রাণের টানে, নিজের কথা বলার জন্য? না কি তৎকালীন সমাজের নারীর বঞ্চনা একটি চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করেছিলেন? ঊনবিংশ শতকের নারীর চিন্তায় কি বর্তমান সময়ের নারীবাদী চিন্তার কোন প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়? এই সকল প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণ করার চেষ্টা করেছি “রাসসুন্দরীদেবীর চিন্তায় নারীবাদ” প্রবন্ধে।

প্রশ্ন উঠতে পারে প্রবন্ধটির নামকরণে ‘চিন্তায়’ শব্দটি কেন দেওয়া হল? রাসসুন্দরী দেবী আত্মজীবনী রচনা করেছেন, তাই তাঁর লেখায় যা পাই তাই আমাদের আলোচ্য বিষয় হওয়ার কথা, সেক্ষেত্রে প্রবন্ধটির নাম হওয়া উচিত “রাসসুন্দরীদেবীর লেখাতে নারীবাদ”। “আত্মজীবনীতে আত্মর অনুসন্ধান করতে হলে তাই বলা কথার থেকে না বলা কথার বিশ্লেষণ জরুরি হয়ে পড়ে। নীরবতাকে মূল্যবান সাক্ষ্য বলে ধরতেই হয়। মেয়েদের লেখায় সচরাচর আত্ম-বিষয় সরাসরি উচ্চারিত হয় না। আত্মকে খুঁজতে চাইলে সেই অনুচ্চারণগুলি উদ্ধার করার প্রয়াস করতে হয়।”^৪ রাসসুন্দরীদেবীর শব্দে অনুচ্চারিত চিন্তাগুলিও এই প্রবন্ধে অনুসন্ধান করার চেষ্টা করা হয়েছে, তাই প্রবন্ধটির নামকরণ করা হয়েছে “রাসসুন্দরীদেবীর চিন্তায় নারীবাদ”।

সময়কাল :

সময়কাল বলতে রাসসুন্দরী দেবীর জীবনের কালপঞ্জী অর্থাৎ গুরুত্বপূর্ণ সময়গুলো এখানে উল্লেখ করবো। কারণ যেকোন ঘটনা যখন ঘটে তখন তার সময়ানুযায়ী পারিপার্শ্বিক কিছু কারণ অবশ্যই থাকে। তাই সময় ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রেক্ষিতে ঘটনাটি ব্যাখ্যা করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এখানে সেই উদ্দেশ্যেই সময়কাল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

রাসসুন্দরী দেবীর জন্ম ১২১৬ সালের চৈত্র মাসে (১৮১০ সাল) বর্তমানে বাংলাদেশের অন্তর্গত পাবনা জেলার পোতাসিয়া গ্রামে এক অতি সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে।ⁱ তাঁর বয়স যখন ৪, তখন তাঁর পিতার পদ্মলোচন রায়ের মৃত্যু হয়।ⁱⁱ তার ফলে মায়ের আদরে লালিত ও পালিত হন রাসসুন্দরী দেবী এবং অভিভাবক ছিলেন খুড়ো মহাশয়। শৈশবে অতি ভীষণ প্রকৃতির হওয়ার জন্য তাঁর খুড়োমশাই তাঁকে (বাড়িতেই গ্রামের ছেলেদের জন্য ছিল পাঠশালা) বাড়ির স্কুলে মেমসাহেবের পাশে বসিয়ে রেখে যেতেন, তখন তাঁর বয়স ৮। এই প্রসঙ্গে তিনি “আমার জীবন”এ বলেছেন, “বাস্তালা স্কুল আমাদের বাড়িতেই ছিল। আমাদের গ্রামের সকল ছেলে আমাদের বাড়িতেই লেখাপড়া করিত। একজন মেমসাহেব ছিলেন, তিনিই সকলকে শিখাইতেন। পর দিবস প্রাতে আমার খুড়া আমাকে কাল রঙের একটা ঘাগরা পরাইয়া একখানা উড়ানী গায়ে দিয়া সেই স্কুলে মেমসাহেবের কাছে বসাইয়া রাখিলেন।.... তখন আমার বয়ঃক্রম আট বৎসর।”ⁱⁱⁱ এইখান থেকে ৮বছর বয়সে (১৮১৮ সাল) রাসসুন্দরী দেবী অক্ষর জ্ঞান লাভ হয়। তিনি নিজেই বলেছেন, “ছেলেরা ক খ চৌত্রিশ অক্ষরে মাটিতে লিখিত, পরে এক নড়ি হাতে লইয়া ঐ সকল লেখা উচ্ছেদ স্বরে পড়িত। আমি সকল সময় থাকিতাম। আমি মনে মনে ঐ সকল পড়াই শিখিলাম। আমি যে ঐ সকল পড়া মনে মনে শিখিয়াছি, তাহা আর কেহ জানিত না।”^{iv} উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, এই সময়ে শিশু মনেই হয়তো কোথাও দাগ কেটেছিল যে, বাড়িতে স্কুল হওয়া সত্ত্বেও শুধুমাত্র মেয়ে বলে তাঁর পড়াশোনা করার অধিকার নেই। দুর্ভাগ্যক্রমে দুবছর পর বাড়িতে আগুন লেগে স্কুলটি বন্ধ হয়ে যায়। এরপর ১২ বছর বয়সে (১৮২২ সাল) রামদিয়া গ্রামে রাসসুন্দরী দেবীর বিয়ে হয়ে যায়।^v এই সময়ে তাঁর মনের অবস্থা ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেছেন, “বাস্তবিক আপনার মা ও আপনার সকলকে ছাড়িয়া ভিন্ন দেশে গিয়া বাস এবং যাবজ্জীবন তাহাদিগের অধীনতা স্বীকার, আপনার মাতাপিতা কেহ নহেন—এটি কি সামান্য দুঃখের বিষয়! কিন্তু ইহা ঈশ্বরাদীন কর্ম, এইজন্য ইহা প্রশংসার যোগ্য বটে।”^{vi} ১২ বছরের একটি শিশুকে বিয়ে দিয়ে শ্বশুরবাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়ার এই প্রথা অর্থাৎ বাল্যবিবাহ প্রথা কোন ব্যক্তি কেন্দ্রিক সৃষ্ট নয়, এর জন্য কোন একজন ব্যক্তিকে দায়ী করা যাবে না; এটি তৎকালীন সমাজের প্রচলিত রীতি বা প্রথা। তাই রাসসুন্দরী দেবী বলেছেন, “ইহা ঈশ্বরাদীন কর্ম”। এরপর ১৮ বছর বয়সে তাঁর প্রথম পুত্র সন্তান বিপিনবিহারীর জন্ম। এরপর ২১ বছরে পুলিনবিহারী, ২৩ বছরে এক কন্যা রামসুন্দরী, এই ভাবে ১২টি সন্তানের মা হন, ৪১ বৎসরে কনিষ্ঠ পুত্রের জন্ম হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য ৩৪ বছর বয়সে পুত্র কিশোরীলালের (১৯৪৪ সাল) জন্ম হয়। ১৮ বছর থেকে ৪১ বছর এই ২৩ বছরে ১২টি সন্তানের জন্ম দেওয়া খুব একটা সহজ বিষয় নয়। তিনি নিজে এই প্রসঙ্গে বলেছেন, “ঐ ২৩ বৎসর আমার যে কি প্রকার অবস্থায় গত হইয়াছে তাহা পরমেশ্বর জানিতেন, অন্য কেহ জানিত না।”^{vii} এর মধ্যে রাসসুন্দরী দেবী মনের লেখাপড়া শিখে পুঁথি পড়ার বাসনা প্রবল হয়। বড় ছেলের বয়স যখন ৮ বৎসর মানে তাঁর বয়স তখন ২৬ (১৮ বছর বয়সে বড় ছেলেটির জন্ম হয়েছিল) সালটি হল ১৮৩৬ খ্রীস্টাব্দ, তখন চৈতন্যভাগবত পুস্তকটি তাঁর হাতে আসে। অনেক কষ্ট করে সকলের অলক্ষ্যে শেষ পর্যন্ত তিনি পড়তে শিখলেন।

‘আমার জীবন’-এ তিনি এ প্রসঙ্গে বলেছেন, “আমি অনেক দিবসে, অনেক পরিশ্রমে, অনেক যত্নে এবং অনেক কষ্ট করিয়া ঐ চৈতন্যভাগবত পুস্তকখানি গোঙ্গাইয়া পড়িতে শিখলাম”।^{১৮} পড়তে শিখলেও তিনি দীর্ঘকাল লিখতে শেখেননি। কিন্তু তাঁর সপ্তম পুত্র কিশোরীলাল কলকাতায় পড়তেন, মাকে সেখান থেকে চিঠি লিখতেন। মা পড়তেন, কিন্তু উত্তর দিতে পারতেন না। কিশোরীলাল বাড়ি ফিরে একবার খুব জেদ করে মা যাতে চিঠির উত্তর দেন এবং কাগজ, কলম, দোয়াত, কালি ইত্যাদি কিনে দিয়ে যান। ফলত সময় সুযোগ করে তিনি লিখতে শেখেন। এই প্রসঙ্গে তিনি আত্মজীবনী “আমার জীবন” এ বলেছেন, “ইতিমধ্যে হঠাৎ এক দিবস কর্তাটির সান্নিপাতিকের পীড়া হইয়া চক্ষের পীড়া দেখা দিল। তখন ঐ চক্ষের চিকিৎসা করিতে কর্তাটি গোয়াড়ী কৃষ্ণনগর গেলেন। সে সঙ্গে আমাকেও যাইতে হইল। আমার পঞ্চম পুত্র দ্বারকানাথের বিষয় কন্মের স্থান কাঁঠালপোতা, আমাদের সেই বাসাতে থাকা হইল। সেই স্থানে আমাদের ছয় মাস থাকিতেও হইল। তখন বাটার অপেক্ষা আমার কাজের অনেক লাঘব হইল। সেই অবকাশে যৎকিঞ্চিৎ লেখা আমার হস্তগত হইল।”^{১৯} গোলাম মুরশিদ ‘রাসসুন্দরী থেকে রোকেয়া : নারীপ্রগতির একশ বছর’ গ্রন্থে রাসসুন্দরী দেবীর লেখা শেখার সময়কাল নির্ণয় করে বলেছেন, “কিশোরীলালের বয়স যদি কুড়ি বছর হয়, তা হলে ঘটনাটা ১৮৬৪ সালের। কারণ কিশোরীলাল জন্মগ্রহণ করেন যখন তাঁর মায়ের বয়স ৩৪। আর তাঁর মায়ের জন্ম ১৮১০ সালে”।^{২০} ১৮৬৯ সালে রাসসুন্দরী দেবীর স্বামী মারা যান^{২১}, সুতরাং তখন তাঁর বয়স ৫৯। খুব আশ্চর্যের বিষয় এই সময় বা এর পরই তিনি আত্মজীবনীটি রচনা শুরু করেন। কারণ তিনি নিজেই বলেছেন, “আমার যখন ৬০ বৎসর বয়ঃক্রম সেই সময় আমার জীবন বৃত্তান্ত যৎকিঞ্চিৎ লেখা হইয়াছিল”।^{২২} এর থেকে বোঝা যায় ১৮৭০ সালে (৬০ বৎসর বয়স) তাঁর লেখার কাজ চলছিল।

উনবিংশ শতকে বঙ্গনারী :

রাসসুন্দরী দেবীর জীবনে জন্ম থেকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সময়কাল জানার পর দেখবো সেই সময়কালে বাংলাতে নারীদের শিক্ষা, সাহিত্য প্রমুখ ক্ষেত্রের চিত্রটি ঠিক কেমন ছিল? সমাজ ও সংসারকে সুন্দর ও সুসংহত রূপ দেবার জন্য বিভিন্ন প্রথা ও নিয়ম-কানুনের প্রচলন হয়ে থাকে। তবে কোন কোন সময়ে সামাজিক নিয়ম কানুন, সমাজভুক্ত মানুষের পক্ষে হয়ে ওঠে প্রাণান্তকর। এদেশে বিশেষ করে মধ্যযুগে কয়েকটি নিষ্ঠুর সামাজিক প্রথা নারীজাতির জীবনকে পঙ্গু করে দিয়েছিল। যেমন, সহমরণ প্রথা, পুরুষের বহুবিবাহ ও কৌলিন্য প্রথা, বাল্যবিবাহ, বিধবা নিগ্রহ, অবরোধপ্রথা এবং সব থেকে ভয়ানক শিক্ষায় অধিকার থেকে বঞ্চিত করা। উনবিংশ শতকে এই সামাজিক কুপ্রথাগুলিকে দূরীভূত করার জন্য অভূতপূর্ব আলোড়ন জেগে উঠেছিল।

নারী জাগৃতি আন্দোলনের প্রথম পদক্ষেপ হল সতীদাহ প্রথার উচ্ছেদ। রামমোহন রায়ের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই ডিসেম্বর তৎকালীন ইংরেজ গভর্নর জেনারেলের লর্ড উইলিয়াম বেন্টিনক সতীদাহ প্রথাকে বেআইনী বলে ঘোষণা করেন। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ২৬শে জুলাই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রচেষ্টা ও ইংরেজ সরকারের সহায়তায় বিধবা বিবাহ আইন প্রবর্তিত হয়—নারী জাগৃতি আন্দোলনের ক্ষেত্রে এটি আর একটি মাইলস্টোন। ইতিপূর্বে বাংলাতে নারীশিক্ষা প্রসার ঘটতে আরম্ভ হয়েছে। নারীশিক্ষা বিস্তারের কাজে প্রথম এগিয়ে এসেছিলেন খ্রীষ্টান মিশনারিরা। “কলিকাতার মিশনারিরা প্রথম ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে ‘ক্যালকাটা ফিমেল জুভিনাইল সোসাইটি’ নামে একটি সংস্থা গঠন করেন ও তার সাহায্যে দেশীয় বালিকাদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেছিলেন।”^{২৩} শ্রীরামপুরে ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়াম কেরী ও তাঁর দুই সহকারী জেশুয়া মার্শম্যান ও উইলিয়াম ওয়ার্ড, স্থানীয় বালিকাদের জন্য বাংলা

ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেবার জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। মিশনারিগণ এদেশে নারী শিক্ষার প্রথম পথপ্রদর্শক হলেও তা ছিল অনেকাংশে উদ্দেশ্য প্রণোদিত; বাঙালি মেয়েদের ধর্মাস্তরিত করার উদ্দেশ্যেই মিশনারিরা বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। ১৮৪৯ খ্রীস্টাব্দে বেথুন সাহেব কলকাতায় একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন, সেখানে বিদ্যাসাগর মহাশয় অবৈতনিক সম্পাদকরূপে যোগদান করেন। এরপর ১৮৫৭র নভেম্বর থেকে ১৮৫৮র মে মাসের মধ্যে বঙ্গদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

নারী প্রগতি ও স্ত্রীশিক্ষা আন্দোলনে ব্রাহ্মসমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। ব্রাহ্ম ধর্মের প্রবর্তক রামমোহন রায় তাঁর সংস্কার কর্মের কাজই শুরু করেছিলেন মেয়েদের নিয়ে। রামমোহনের রায়ের পর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, তিনি নিজের কন্যা, পুত্রবধূ, পৌত্রি, পৌত্রবধূ, দৌহিত্রী সকলেরই সুশিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের ‘ভারত আশ্রম’ নামে পারিবারিক প্রতিষ্ঠানেও বহু ব্রাহ্ম মহিলা শিক্ষালাভের সুযোগ পেয়েছিলেন। সম্মুদ্র চক্রবর্তী তাঁর ‘অন্দরে অন্তরে’ গ্রন্থে বলেছেন, ‘ব্রাহ্মরা ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি সমাজের পক্ষে যথেষ্ট প্রাণসর ছিলেন। তাঁরা অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষা প্রণালী চালু করেছিলেন এবং নিজেদের বাড়ির মেয়েদের শিক্ষা দিতে কুণ্ঠিত হননি। বস্তুতঃপক্ষে ঊনবিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকের শেষ ভাগ পর্যন্ত শিক্ষিত বাঙালি মেয়েদের অধিকাংশই ছিল হয় খ্রিষ্টান, নতুবা ব্রাহ্ম’।^{১৪} নারীজাতির অবমাননার আরও একটি প্রথা হল অবরোধ প্রথা। তখনকার দিনে বাড়ির দুইটি মহল দেখতে পাওয়া যেত। পুরষরা থাকে বাইরে আর মেয়েরা ভিতরের মহলে। ১৮৬২ খ্রীস্টাব্দে সাধারণ সভার প্রার্থনা সভায় কেশবচন্দ্র সেন অবরোধ প্রথাকে লঙ্ঘন করে তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে উপস্থিত হন। এর ফলে সেদিন ব্রাহ্মসমাজে প্রচণ্ড আলোড়ন হয়েছিল। এরপর ১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দে মিস্ কার্পেন্টারের সংবর্ধনা সভায় অনেক ব্রাহ্ম যুবক সস্ত্রীক উপস্থিত হয়েছিলেন। নারী প্রগতি বিশেষ করে এই অবরোধ প্রথাকে লঙ্ঘন করার ক্ষেত্রে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, “আন্দরমহলের পর্দা রইল না। আজ এ কথা নতুন ঠেকবে না, কিন্তু তখন এত নতুন ছিল যে মেপে দেখলে তার থই পাওয়া যায় না। তারও অনেক কাল আগে, আমি যখন শিশু, মেজদাদা সিভিলিয়ান হয়ে দেশে ফিরেছেন। বোম্বাইয়ে প্রথম তাঁর কাজে যোগ দিতে যাবার সময় বাইরের লোকদের অবাধ করে দিয়ে তাদের চোখের সামনে দিয়ে বউঠাকরুনকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। বাড়ির বউকে পরিবারের মধ্যে না রেখে দূর বিদেশে নিয়ে যাওয়া এই তো ছিল যথেষ্ট, তার উপরে যাবার পথে ঢাকাঢাকি নেই—এ যে হল বিষম বেদস্তুর। আপন লোকদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল।”^{১৫}

এবারে তৎকালীন সমাজে নারীদের জ্ঞানচর্চা ও সাহিত্য সাধনার কথা বলা যেতে পারে। ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দে উমেশচন্দ্র দত্তের সম্পাদনায় নারীদের সাহিত্য সাধনার উপলক্ষ্যে ‘বামাবোধিনী পত্রিকা’ প্রকাশিত হয়। বাংলা সাহিত্যের ধারার প্রথম দিকেই নারীজীবনের বিবিধ সমস্যা নিয়ে তাঁদের দ্বারা রচিত বেশ কিছু রচনা দেখতে পাওয়া যায়। যেমন বামাসুন্দরী দেবী, ইনিই প্রথম নারী যিনি নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় গ্রন্থ রচনা করেছেন। ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দে ‘কি কি কুসংস্কার তিরোহিত হইলে এদেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে’ ২০ পৃষ্ঠার এই বইটি রচনা করে। কৈলাসবাসিনী দেবী তাঁর ‘হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা’ (১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দে) গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে বলেছেন, “আমি এই স্থলে শ্রীমতি বামাসুন্দরী দেবীকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে এবং বর্ণ ও বিদ্যাশ্রেষ্ঠ প্রযুক্ত প্রণাম করিতে বাধ্য হইলাম। বামাসুন্দরী আমাদিগের পথ প্রদর্শিকা রূপে এই বঙ্গভূমিতে অবতীর্ণা হইয়া আমার মনকে উত্তেজনা করিলেন, আমি তাঁহার সেই উত্তেজনায় লজ্জিতা হইয়া এইরূপ ব্যবসায় প্রবৃত্ত হইলাম, তিনি এই বঙ্গভূমিতে জন্ম গ্রহণ করত আমাদিগকে আকর্ষণ করিলেন, আমরা তাঁহারই

আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া পদ চারণে পারগ হইলাম। তাঁহারই যশঃ শশাঙ্কের বিমল কিরণ দর্শনে আমরা বিষম তামসীর বিভীষিকা দর্শন হইতে মুক্ত হইলাম। তিনি উৎসাহিনী না হইলে আমরা কখন এই ভাব প্রাপ্ত হইতাম না। চিরকালই জড় পদার্থের ন্যায় অবস্থিতি করিতাম এবং আমাদিগের মনোগত ভাব সকল বার্কশক্তি রহিত ব্যক্তির স্বপ্নের ন্যায় মনেতেই লয় পাইত।”^{১৬} কৈলাসবাসিনী দেবী স্বামী শ্রীদুর্গাচরণ গুপ্তের ইচ্ছাতে তাঁর কাছেই শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি নিজের শিক্ষা গ্রহণ সম্পর্কে বলেছেন, “১৭৭১ শকের শ্রাবণ মাসে আমাকে বর্ণমালার প্রথম ভাগের উপদেশ দেন; আমি সেই অবধি গোপনভাবে কিঞ্চিৎ অধ্যয়ন করিতাম এবং গুরুজন ভয়ে ভীত হইয়া বিদ্যাকে অতি দুষ্কর্ম বোধে লুকাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিতাম।”^{১৭} এইরূপ এক সামাজিক প্রেক্ষাপটে ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে বাংলা ভাষাতে লিখিত প্রথম আত্মজীবনী “আমার জীবন” রচিত হয়।

নারীবাদী চিন্তা ও ব্যক্তিসত্তার উত্তরণ :

ঊনবিংশ প্রথম দিকে একজন গ্রাম্য আদর্শ গৃহিণী, যিনি ১২জন সন্তানের জননী, তাঁর লেখা বা চিন্তাতে নারীবাদী চিন্তা এক বিস্ময়কর ঘটনাই বটে। সুতপা ভট্টাচার্য খুব সুন্দর করে বলেছেন, “সামাজিক, অধিকার এবং অবস্থানের দিক থেকে নারী-পুরুষের পার্থক্য নির্দেশ করা, সে বিষয়ে প্রতিবাদ করা—অভিধান অনুসারে ফেমিনিজমের সংজ্ঞা তাই-ই। রাসসুন্দরীর মতো ঘরোয়া ভক্তিমতি গৃহকর্মনিপুণা মেয়েটির বয়ানেও তবে থাকতে পারে নারীবাদের কথা, সেই ১৮৭০ সালেই! কেনই বা থাকবে না, আত্ম বিষয়ে যদি কেউ সচেতন থাকে, তবে তো তার নারীত্ব বিষয়ে, তার পরাধীনতার বিষয়েও তাকে সচেতন হতেই হবে।”^{১৮} সত্যই বিস্ময়ই জাগে যখন দেখতে পাওয়া যায় যে, ঊনবিংশ শতকে একজন সাধারণ গৃহবধূ সামাজিক ক্ষেত্রে একজন নারী হিসাবে বঞ্চনা, অধিকার ও অবস্থানের বিভিন্ন চিত্র বলা ও না-বলার মধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে তোলেন।

“আমার জীবন” আত্মজীবনীতে দেখতে পাওয়া যায় ১২ বছর বয়সে তাঁর বিয়ে হয়। অর্থাৎ ঊনবিংশ শতকে বাংলার সমাজে প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী তাঁর বাল্যবিবাহ হয়। এই সময়ে ‘বিবাহ’ নামক যে প্রতিষ্ঠান সে সম্পর্কে তিনি কিছুই জানতেন না। ১২ বছরের একটি শিশুর জানার কথাও নয়। বিয়ের কথা শুনে রাসসুন্দরী দেবী মাকে বলেছিলেন, “মা! আমাকে যদি কেহ চাহে, তবে কি তুমি আমাকে দিবে?” মা উত্তরে কাঁদতে কাঁদতে বলেছিলেন, “তোমাকে কেমন করিয়াই বা দিব।” তৎসত্ত্বেও তাঁর বিয়ে হয় এবং মা, আত্মীয়-পরিজনদের ছেড়ে দূরে পাড়ি দিতে হয়। তাই বছর এই ‘বিবাহ’ প্রথা সম্পর্কে বিভিন্ন আক্ষেপ মূলক কথা তাঁর লেখাতে পাওয়া যায়। “তখন আমার মনের ভাব কি বিষম হইয়াছিল! যখন দুর্গোৎসবে কি শ্যামাপূজায় পাঁঠা বলি দিতে লইয়া যায়, সে সময়ে সেই পাঁঠা যেমন প্রাণের আশা ত্যাগ করিয়া হতজ্ঞান হইয়া মা মা মা বলিয়া ডাকিতে থাকে, আমার মনের ভাবও তখন ঠিক সেই প্রকার হইয়াছিল। আমি আমার পরিবারগণকে না দেখিয়া, অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া মা মা বলিয়া কাঁদিতে লাগিলাম।”^{১৯} বিয়ে হওয়াকে পূজাতে একটি পাঁঠাকে বলি দেওয়ার সঙ্গে তুলনা করেছেন। কারণ পূজাতে পাঁঠা বলি দেওয়ার সময় যেমন পাঁঠাটি নিরুপায়, এখানে রাসসুন্দরী দেবীর অবস্থাও তেমন। বাল্যবিবাহের ক্ষেত্রে বালিকার মতামতের কোন গুরুত্ব নেই, সে সমাজ ও পরিবারের চাপে সত্যিই অসহায়। আর এই অসহায়তা থেকেই বলির পাঁঠার মতো ‘মা মা মা’ করে কান্না। এখানে রাসসুন্দরী দেবী যে দুঃখ ও যন্ত্রণার কথা বলেছেন, তা সমাজে অন্য সকল নারীর কথা। তৎকালীন সমাজে বাল্যবিবাহই প্রচলিত ছিল এবং এই একইভাবে ‘বিবাহ’ কি তা জানার আগেই ছোট ছোট মেয়েদের বাবা, মা, আত্মীয়, বন্ধুদের ত্যাগ করে দূরদেশে পরিবার ও সমাজের ইচ্ছানুযায়ী চলে যেতে হতো।

বিয়ের পরবর্তী সময়ের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন, “আমার মা আমাকে দেখিবার জন্য কত রোদন করিতেন এবং আমাকে লইয়া যাইবার জন্যই বা কত যত্ন করিতেন। আমি এখানে আসিয়া অন্ধ দায়মালী কারাগারে বন্দী হইয়াছি। এই সংসারের কাজ চলিবে না বলিয়া প্রাণান্তেও আমাকে পাঠানো হইত না। তবে যদি কোন ক্রিয়া উপলক্ষে আমার যাওয়া হইত, কিন্তু কয়েদী আসামীর মত দুই চারি দিন মধ্যে আমাকে ফিরিয়া আসিতে হইত”।^{২০} এখানে দেখতে পাওয়া যায়, বিয়ের পর শ্বশুরবাড়িতে থাকাকে ‘কারাগারে বন্দী’ বলে নিজেকে দাবী করেছেন।

রাসসুন্দরী দেবীর লেখাতে সব থেকে বেশি ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে যেখানে শুধুমাত্র মেয়ে হয়ে জন্ম গ্রহণ করার জন্যই তিনি মায়ের মৃত্যুর সময় শেষবারের মতো একবার মায়ের সঙ্গে দেখাও করতে পারেন নি। এ সম্পর্কে তিনি বলেছেন, “আমি এমন অধমা পাপীয়সী, মায়ের মৃত্যুকালেও তাঁহাকে যত্ন দিয়াছি! আমি মাকে দেখিবার জন্য কত প্রকারে চেষ্টা পাইয়াছিলাম, কিন্তু আমার দুরদৃষ্টত্বের কোন ক্রমেই যাওয়া ঘটিয়া উঠে নাই। এটি কি আমার সাধারণ আক্ষেপের বিষয়! হা বিধাতঃ! তুমি কেনই বা আমাকে মানবকূলে সৃষ্টি করিয়াছিলে? পৃথিবী মধ্যে পশু পক্ষ্যাদি যে কিছু ইতর প্রাণী আছে, সর্বাপেক্ষা মনুষ্য জন্ম দুর্লভ বটে। সেই দুর্লভ জন্ম পাইয়াও আমি এমন মহা পাতকিনী হইয়াছি। আমার নারীকূলে কেন জন্ম হইয়াছিল? আমার জীবনে ধিক পৃথিবী মধ্যে মাতার তুল্য স্নেহময়ী আর কে আছে। মাতাকে পরমেশ্বরের প্রতিনিধি বলিলেও বলা যায়। এমন যে দুর্লভ বস্তু মা, এই মায়ের সেবা করিতে পারি নাই। আহা! আমার এ দুঃখ রাখিবার কি স্থান আছে? আমি যদি পুত্রসন্তান হইতাম, আর মার আসন্ন কালের সম্বাদ পাইতাম, তবে আমি যেখানে থাকিতাম, পাখীর মত উড়িয়া যাইতাম। কি করিব, আমি পিঞ্জর-বদ্ধ বিহঙ্গী।”^{২১} এই সকল আক্ষেপ থেকেই তিনি বুঝিয়েছিলেন যে, এই সমাজে নারীরা কতটা বঞ্চিত, কতটা অধীন! বিয়ের পর খাঁচায় বন্দী পাখির মতোই নিজেকে মনে করতেন, খাঁচায় পাখি যেমন আস্তে আস্তে পোষ মেনে যায়, রাসসুন্দরী দেবীর অবস্থাও সেইরূপ হয়েছিল।

উনবিংশ শতকে বাংলার নারীদের কথা বলতে গিয়ে অবরোধ প্রথার কথা বলা হয়েছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে যে, উনবিংশ শতকের ষাটের দশকে এই অবরোধ প্রথা উন্মোচনের জন্য কেশব চন্দ্র সেন, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ ব্যক্তি এগিয়ে আসলেও তা কলকাতায় মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু উনবিংশ শতকে রামদিয়া গ্রামের এক গৃহবধূর চিন্তায় এই অবরোধ প্রথার প্রতি ক্ষোভ দেখতে পাওয়া যায়। রাসসুন্দরী দেবী এই প্রসঙ্গে বলেছেন, “বিশেষতঃ তখন মেয়েছেলের এই প্রকার নিয়ম ছিল, যে বৌ হইবে, সে হাতখানেক ঘোমটা দিয়া ঘরের মধ্যে কাজ করিবে, আর কাহারও সঙ্গে কথা কহিবে না, তাহা হইলেই বড় ভাল বৌ হইল। সেকালে এখনকার মত চিকণ কাপড় ছিল না, মোটা মোটা কাপড় ছিল। আমি সেই কাপড় পরিয়া বুক পর্যন্ত ঘোমটা দিয়া ঐ সকল কাজ করিতাম। আর যে সকল লোক ছিল, কাহারও সঙ্গেই কথা কহিতাম না। সে কাপড়ের মধ্য হইতে বাহিরে দৃষ্ট হইত না। যেন কলুর বলদের মত দুইটি চক্ষু ঢাকা থাকিত। আপনার পায়ের পাতা ভিন্ন অন্য কোন দিকে দৃষ্টি চলিত না। এই প্রকার সকল বিষয়ে বৌদিগের কর্মের রীতি ছিল। আমি ঐ রীতিমতোই চলিতাম।”^{২২} “কলুর বলদ” এটি একটি বাগধারা, পরাধীন অর্থে ব্যবহার হয়ে থাকে। এর অর্থ প্রাচীনকালে তৈলকারকে বলা হত ‘কলু’। তিষি, তিল, সরিষা থেকে তেল বার করার জন্য বলদকে কাজে লাগানো হতো। এই সময় বলদের চোখে কাপড় বেঁধে দেওয়া হতো, যাতে তার নজর অন্য দিকে না যায় এবং তারপর তাকে ঘা মারা হতো আর সে বাঁধা অবস্থা নিরুপায় হয়ে ঘুরতে থাকতো। এতে ঘূর্ণনমান মেশিনের দ্বারা তেল উৎপন্ন হতো। এর থেকেই “কলুর বলদ” বাগধারাটির অর্থ করা হয়ে থাকে যে নিজের ভালমন্দ না বুঝে

শুধু মুখবুজে পরের নির্দেশ মতো খেটে মরে। সুতরাং রাসসুন্দরী দেবী তৎকালীন সমাজে নারীজাতির পরাধীনতা, দাস্যতার ছবি কলুর বলদের সঙ্গে তুলনা করেছেন। সুতপা ভট্টাচার্য বলেছেন, “কলুর বলদ আর কলুর সম্পর্কের সঙ্গেই তুলনীয় বলে মনে হয়েছিল তাঁর নিজের আর পরিবারের প্রভুর সম্পর্ক”।^{২৩}

এরপর দেখা শিক্ষা থেকে বঞ্চনার আক্ষেপ। তিনি ৮ বছর বয়সে দেখেছেন গ্রামের ছেলেদের জন্য বাড়িতে স্কুল থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র নারী বলেই স্কুলের সেই শিক্ষা গ্রহণের অধিকার থেকে বঞ্চিত হতেন। এই আক্ষেপ তাঁর মধ্যে তখন থেকে রয়ে গেছিল, তাই বিয়ের পর তিনি বলেছেন, “এইটি ভারী আক্ষেপের ছিল যে, মেয়েছেলে বলিয়া লিখিতে পড়িতে পাইতাম না।”^{২৪} এ কি তাঁর একার কথা? ঊনবিংশ শতকে বাংলার নারী জাতির যে চিত্র দেখেছি তাতে দেখা গেছে যে এই সময় (১৮২২ সালে বিবাহ, তার পরবর্তী সময়ে) বাংলার নারীদের জীবনে সবেমাত্র শিক্ষা আলো প্রবেশ করতে আরম্ভ করেছে। এই আক্ষেপ থেকেই হয়তো তাঁর মনে, পড়তে শেখার ইচ্ছা গভীর ভাবে দানা বাঁধে। এই সময়ে একদিন স্বপ্নে দেখলেন ‘চৈতন্যভাগবত’ পাঠ করছেন। খুব অনন্দিত হয়ে উঠলেন। এ যেন ঈশ্বরের আদেশ। রাসসুন্দরী দেবীর স্বপ্নের বাড়িতে প্রচুর বই ছিল। তিনি ঠিক করলেন ‘চৈতন্যভাগবত’ পড়বেন। কিন্তু তাঁর পক্ষে সে বই খুঁজে বের করা সম্ভব ছিল না। তাই দয়াময়ের কাছে প্রার্থনা চলতে থাকে। একদিন স্বামীর প্রয়োজনে হাতে পেলেন ‘চৈতন্যভাগবত’ গ্রন্থটি। অপরিসীম আনন্দে বইটি হাতে নিয়ে একটি পৃষ্ঠা লুকিয়ে রাখলেন রান্নাঘরে। অক্ষর চেনার সুবিধার্থে বড় ছেলের তালপাতায় লেখা একটি পৃষ্ঠাও লুকিয়ে রাখলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন—“আমি সেই পুস্তকের পাতাটি ও ঐ তালের পাতাটি লইয়া মনের অক্ষরের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিতাম। আমি এই পরকার করিয়া সকল দিবস মনে মনে পড়িতাম। আমি অনেক দিবসে, অনেক পরিশ্রমে, অনেক যত্নে এবং অনেক কষ্ট করিয়া ঐ চৈতন্যভাগবত পুস্তকখানি গোপ্সাইয়া পড়িতে শিখিতাম।”^{২৫} এইভাবে অতি কষ্টে পরিবারকে অস্বীকার না করে, পরিবারে সকল কর্ম সম্পন্ন করে সবার অলক্ষ্যে তিনি পড়তে শিখেছিলেন। এ যেন এক নিঃশব্দে যুদ্ধ জয় জিতাক্ষর হওয়ার।

রাসসুন্দরী দেবী আত্মসত্তার বিকাশের জন্য, একজন পিঞ্জরে বদ্ধ নারীর মুক্তির জন্য তিনি ধর্মকে আঁকড়ে ধরেছিলেন। কারণ এটা নারীর সব থেকে Safe Zone। সমাজ বা পরিবার সব সময় চায় একজন আদর্শ গৃহিনী মানে তিনি ঘর গেরস্তের কাজ কর্ম ও স্বামী সন্তান পরিবারের সকলের সেবা কার্যে নিযুক্ত থাকবেন। আদর্শ গৃহিনী শুধু মাত্র ধর্মকর্মে ছাড় পায়। বিশেষ করে ঊনবিংশ শতকের নারী যেটুকু স্বাধীনতা পেতো তা এই ধর্মের ক্ষেত্রে। তাই ব্রত কথা, ধর্মগ্রন্থ পাঠ বা শোনার ক্ষেত্রে সমাজের বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হতো না। সমাজ ধর্মকর্ম ও সংসারের কাজের বাইরে নারীর কোন অধিকার বা অবস্থানকে মেনে নিতো না। তাই রাসসুন্দরী দেবী ধর্মকেই আঁকড়ে ধরেছিলেন। স্বপ্নের গৃহে মনের কথা বলার জন্য একমাত্র ছিলেন দয়ামাধব। শৈশবে ভয়কে জয় করতে তাঁর মা এই দয়ামাধব মন্ত্র তাঁকে দিয়েছিলেন। জ্যোতিরিদ্রনাথ ঠাকুর ভূমিকাতে বলেছেন, “ইঁহার জননী ইঁহার ভয় নিবারণার্থ ইঁহাকে একটি অভয় মন্ত্র প্রদান করেন। সেই অবধি, সেই অভয় মন্ত্রটি অক্ষয় কবচরূপে তাঁহাকে সারাজীবন রক্ষা করিয়াছে।”^{২৬} তাই দয়ামাধব তাঁর মায়ের আশীর্বাদ ও হারিয়ে যাওয়া পিতা হয়ে উঠেছিল। ‘আমার জীবন’ এ ধর্ম বলতে কিন্তু ব্রত কথা, আচার অনুষ্ঠানের বর্ণনামূলক চিত্র পাওয়া যায় না, ধর্ম এখানে যেন অত্যন্ত জীবন্ত। ধর্ম তাঁর কাছে শক্তি, ধর্ম তাঁর কাছে আশ্রয়, ধর্মই তাঁকে উত্তরণের পথ দেখিয়েছে, তাই ধর্মকে আশ্রয় করেই তাঁর জীবনযাপন। চৈতন্যভাগবত পড়ার জন্যই তাঁর পড়তে শেখা একথা ভুল, পড়তে শেখার ইচ্ছা তাঁর পূর্ব থেকেই ছিল। এই ইচ্ছা যখন ধর্মের সঙ্গে

যুক্ত হল অর্থাৎ চৈতন্যভাগবত পড়ার স্বপ্ন দেখলো তখন আরও শক্তি বা মনের জোর বাড়লো এবং অবশেষে কার্যটি সম্পন্ন হলো।

আত্মজীবনী রচনার উদ্দেশ্য :

বাংলা ভাষায় প্রথম প্রকাশিত আত্মজীবনী বলে খ্যাত ‘আমার জীবন’। তাই পূর্বে আত্মজীবনীর অন্য কোন দৃষ্টান্ত দেখে অনুপ্রাণিত হবার কথা নয়। আর বাংলা ভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষা পড়া বা চর্চা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না, তাই এর পূর্বে ইংরেজি বা অন্য কোন ভাষাতে কোন আত্মজীবনী রচনা হয়ে থাকলেও তা রাসসুন্দরী দেবীর জানার বিষয় নয়। তবে হঠাৎ কেন, কি উদ্দেশ্যে রাসসুন্দরী দেবীর এই আত্মজীবনী রচনা? স্বামী, সন্তান, নিজের পরিবার ও নিজের কষ্টের কথা বলাই কি উদ্দেশ্য? “আমার জীবন” স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কের বা শ্বশুরবাড়ির মানুষজনদের বা পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি বা সন্তানদের কার্যকলাপ বর্ণনা নয়। তবে কি উদ্দেশ্যে এই আত্মজীবনী লেখা? কি বলতে চাইছে লেখিকা এখানে? এই প্রশ্নটি বারবার এসে পড়ে। দেখা যায় রাসসুন্দরী দেবী ১৮৬৪ সাল নাগাদ লিখতে শেখেন আর ১৮৬৯ বা ১৮৭০ সাল নাগাদই তিনি আত্মজীবনী লিখতে শুরু করেন। অর্থাৎ লিখতে শেখার পর অন্য কোন সাহিত্য রচনা নয়, বরং বলা যায়, লেখা শেখা কিছু বছরের মধ্যে আত্মজীবনী লেখা শুরু করেন। গোলাম মুরশিদ এই আত্মজীবনী লেখার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেছেন, “মহিলাদের অবস্থা কেমন ছিল তা তুলে ধরার, অথবা তার মাধ্যমে মহিলাদের হীনাবস্থা সম্পর্কে সচেতন করে তোলার কোনো উদ্দেশ্য তাঁর ছিল না।”^{২৭} তিনি আরও বলেছেন, “রাসসুন্দরী সংসারের এককোণে সংকোচে জীবন যাপন করে গেছেন। কোন দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চাননি; অথবা কারো ওপর প্রভাবও বিস্তার করতে চাননি। নিতান্ত আপন প্রাণের টানে লিখেছিলেন তাঁর আত্মজীবনী।”^{২৮} কিন্তু এই রকম দাবী কি নিশ্চিত রূপে করা যায়? আপন মনের টানে নিছক আত্মজীবনী রচনার ইচ্ছাতেই লিখে ফেললেন—একথা কি মেনে নেওয়া যায়! যার সামনে আত্মজীবনীর কোন দৃষ্টান্ত নেই, যিনি আগে বা পরে অন্য কোন সাহিত্য রচনা করেন নি তিনি কি শুধুমাত্র মনের টানে লিখতে পারেন আত্মজীবনী! বরং বলা যায় নারীজাতির প্রতি অবমাননা, বঞ্চনার বিরুদ্ধে নীরবে দাঁড়াবার জন্যই তিনি তৎকালীন সময়ে সমাজলঙ্ঘনকারী কাজ করেছিলেন। সাম্প্রতিককালের একটি গবেষণা পত্রে দেখা যায় যে, রাসসুন্দরীদেবী তৎকালীন সমাজে ৩টি সমাজলঙ্ঘনকারী কাজ করেছিলেন, “So there are three major “transgressions” that Rassundari Devi commits according to patriarchy : reading, writing and entering the public sphere.”^{২৯} লেখা পড়া শেখার সঙ্গে সঙ্গে উনি আত্মজীবনী প্রকাশের যে কাজ করেছেন তাও এক সমাজ লঙ্ঘনকারী কাজ। কারণ যখন কোন লেখা প্রকাশিত হয়ে যাচ্ছে তখন সেটি আর ব্যক্তিগত স্তরে থাকে না। তা তখন সার্বজনীন স্তরে উপনীত হয়, যেখানে বিষয়টি উন্মুক্ত হয়ে যায় পর্যবেক্ষণ, গবেষণা ও বিভিন্ন প্রশ্নের জন্য।^{vi} রাসসুন্দরী দেবীর এই সমাজলঙ্ঘনকারী কাজের কারণ তৎকালীন সমাজে বিভিন্ন অধিকার থেকে নারীর বঞ্চনা। সুতরাং রাসসুন্দরী দেবী “আমার জীবন” ঊনবিংশ শতকের এক নারীর উত্তরণের চিত্র। এখানে বলা হয়েছে অনেক কিছু, আবার না বলা অর্থাৎ অব্যক্ত থেকেও অনেক কথা বলা হয়েছে। এই বলা ও না-বলার মধ্যে দিয়ে এক নারীর উত্তরণের প্রকাশ ঘটেছে; যা আজকের নারীদের কাছেও দৃষ্টান্তস্বরূপ। রাসসুন্দরী দেবী ‘আমার জীবন’ নারীর বঞ্চনা ও অধিকার নিয়ে যে কথা বলে গেছেন তা সমাজের নারীর উত্তরণের কথা, এই উত্তরণের মধ্যে নারীবাদী দর্শনের প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়।

বর্তমান দিনে দেশে, বিদেশে মনের শক্তি নিয়ে অনেক গবেষণামূলক কাজ হচ্ছে।^{vii} ‘মনের শক্তি’কে এখন প্রায়

প্রত্যেকেই স্বীকার করে নিয়েছে। Dr Joseph Marfi “The Power Of Your Subconscious” গ্রন্থে বলেছেন, “আপনার মন আপনার সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। এটি সবসময়ই আপনার সঙ্গে আছে তবে এর অত্যাশ্চর্য শক্তির অধিকারী তখনই হতে পারবেন যখন এটিকে ব্যবহার করতে শিখবেন। আমরা দেখেছি মনের দুটি লেভেল বা মাত্রা রয়েছে—একটি হল চেতন বা বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন লেভেল। অপরটি অবচেতন বা অবিচারবুদ্ধিসম্পন্ন লেভেল। আপনি আপনার চেতন মন নিয়ে চিন্তা করেন এবং আপনি যা ভাবতে অভ্যস্ত তা আপনার অবচেতন মনের কাছে পৌঁছে যায় এবং আপনার চিন্তার প্রকৃতি অনুযায়ী তা পরিবেশ তৈরি করে। এটি সৃষ্টিশীল মন। আপনি সুচিন্তা করলে ভালো কিছু আপনাকে অনুসরণ করবে; আপনি কুচিন্তা করলে খারাপ কিছু আপনার পিছু নেবে। এভাবেই আপনার মন কাজ করে।”^{৩০} স্বামী বিবেকানন্দ মন ও মনের শক্তি নিয়ে অনেক কথা বলে গেছেন। “সংযত ও সুনিয়ন্ত্রিত মন, আমাদিগকে রক্ষা করিবে, মুক্তিদান করিবে।”^{৩১} উনবিংশ শতকে দাঁড়িয়ে রাসসুন্দরী দেবী এই মনের শক্তির উপরে নির্ভর করেছেন। সমাজে ও পরিবারে নারীর বঞ্চনার কথা, তাঁর মনের কথা সমাজের সামনে রাখার জন্যই ‘আমার জীবন’এর সৃষ্টি। ফলত রাসসুন্দরী দেবী আত্মজীবনী রচনা নিছক প্রাণের টানে একথা বলা ঠিক নয়।

উপসংহার :

উনবিংশ শতকের বাংলার প্রত্যন্ত গ্রামের এক আদর্শ গৃহিনী রাসসুন্দরী দেবী রচিত আত্মজীবনী ‘আমার জীবন’এ যে নারীবাদী চিন্তা দেখতে পাওয়া যায়, তার সঙ্গে বর্তমান দিনের কেরল গিলিগানের মতের বেশ কিছু সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। গিলিগান প্রখ্যাত মার্কিন মনস্তত্ত্ববিদ কোহলবার্গের মনোবিকাশ ও নৈতিকতার স্তরভেদ সম্বন্ধীয় তত্ত্বের বিরোধিতা করে নতুন একটি তত্ত্ব নির্মাণ করেছিলেন। গিলিগান কোহলবার্গের ব্যক্তির মনস্তাত্ত্বিক ও নৈতিক বিকাশ সম্বন্ধীয় তত্ত্বকে পক্ষপাতযুক্ত বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেছেন যে, নারীর স্বতন্ত্র ও নিজস্ব সত্ত্বাবোধ এবং নিজস্ব নৈতিকতাবোধ আছে।

কোহলবার্গ মানুষের নৈতিক বিকাশের ৩টি প্রধান স্তরের কথা বলেছেন—Preconventional বা প্রথাগত স্তর, Conventional বা প্রচলিত স্তর, Postconventional বা উত্তর প্রচলিত স্তর। নৈতিকতার প্রথাগত স্তরে ছেলেমেয়েরা পিতা-মাতা ও কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে জানতে পারে কোনটি ভালো আর কোনটি মন্দ এবং তারা তা মেনে চলে শাস্তি এড়ানোর জন্য। ফলে এই স্তরে নৈতিক ভাবনা নিজের দিকে নিবদ্ধ থাকে—কর্তৃপক্ষকে অনুসরণ করা ও নিজেকে শাস্তি থেকে রক্ষা করার মধ্যে দিয়ে।

কৈশোরে উপনীত হলে তারা সংবদ্ধতা তৈরি করে ও পরিবার, বন্ধুবর্গ, ধর্ম ও জাতির অনুগত হয়। ফলশ্রুতিতে, এই প্রচলিত স্তরে নৈতিকতা গড়ে উঠে গোষ্ঠীর অন্যান্য সদস্যদের কাছে গ্রহণীয় হওয়াকে এবং তাদের রীতিগত নৈতিক মানদণ্ড ও নিয়ম অনুসরণকে ভিত্তি করে।

নৈতিক বিকাশের সর্বোচ্চস্তরে অর্থাৎ উত্তর প্রচলিত স্তরে কল্যাণ, ন্যায় ও অধিকার সম্পর্কিত সর্বজনীন নীতির উপর নৈতিকতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

কোহলবার্গ বলেন মানুষের এই আত্মকেন্দ্রিকতা থেকে ক্রমেই সার্বিক নীতি ভিত্তিক চিন্তার স্তরে উপনীত হবার ক্ষেত্রে ছেলেরা মেয়েদের চেয়ে অনেক এগিয়ে। ক্যারল গিলিগান তাঁর ‘In a different voice’ গ্রন্থে বলেছেন, “Prominent among those who thus appear to be deficient in moral development when measured by Kohlberg’s scale are women, whose judgements seem to exemplify the third

stage of his six stage sequence. At this stage morality is conceived in interpersonal terms and goodness is equated with helping and pleasing others. This conception of goodness is considered by Kohlberg and Kramer (1969) to be functional in the lives of mature women insofar as their lives take place in the home. Kohlberg and Kramer imply that only if women enter the traditional arena of male activity will they recognize the inadequacy of this moral perspective and progress like men toward higher stages where relationships are subordinated to rules (stage four) and rules to universal principles of justice (stages five and six).^{viii ৩২}

অর্থাৎ কোহলবার্গ এখানে যে মানদণ্ড ব্যবহার করেছেন সেই অনুযায়ী নারীদের নৈতিক বিকাশে ঘাটতি দেখানো হয়েছে। গিলিগান এর বিরোধিতা করে বলেছেন, “In (Kohlberg’s) version of moral development, however, the conception of maturity is derived from the study of men’s lives and reflects the importance of individuation in their development.”^{৩৩} গিলিগান নারীদের জন্য নৈতিক বিকাশের নিজস্ব পর্যায় তত্ত্ব তৈরি করেছিলেন। প্রথাগত স্তরে (Preconventional stage) নারী নিজের প্রতি যত্নবান থাকে sal (Goal is individual survival); প্রচলিত স্তরে (Conventional stage) উপনীত হয়ে সে অন্যদের প্রতি যত্নবান হন (Self sacrifice is goodness); এবং সর্বোচ্চ স্তর অর্থাৎ উত্তর প্রচলিত স্তরে (Postconventional stage) সে নিজের ও অন্যদের প্রতি যত্নের ক্ষেত্রে একটি ভারসাম্য অর্জন করে (রাসসুন্দরী দেবীও তাঁর জীবনে তাই করেছিলেন)। তাঁর মতে নারী যে ভাবে নৈতিকতাকে দেখে তা পুরুষের দেখা থেকে ভিন্ন। নৈতিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় নারীরা ব্যক্তিগত সম্পর্কে বড় করে দেখে, পুরুষরা দেখে থাকে পক্ষপাতমুক্ত বিধিনীতিকে। গিলিগান বারবার সম্পর্কের কথা বলেছেন, যত্নের কথা, দরদের কথা বলেছেন; তাই তাঁর নৈতিক মতাদর্শকে ‘কেয়ার বেসড এথিক্স’ বা ‘দরদ ভিত্তিক নৈতিকতা’ বলেছেন। “গিলিগান বলেছেন আমরা ‘সেলফ’ বা ব্যক্তিক সত্তা বলতে যা বুঝি তা কোনো আধিভৌতিক মৌল নয়। ব্যক্তি সত্তা সৃজিত হয় নানান ঘাত প্রতিঘাতে। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক মানুষের ব্যক্তিক সত্তা সৃজনের এক প্রধান উপাদান। এমন বলা যায় না যে ব্যক্তিক সত্তা ও ব্যক্তি বিলোপী সত্তা পরস্পর বিযুক্ত; বলতে হবে এই সত্তা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত অথচ এদের মধ্যে প্রভেদও আছে। যার ফলে একটা সম্পর্কের মধ্যে থেকেও একটা স্বর বা ভয়েস স্পষ্টতই শোনানো যেতে পারে”।^{৩৪}

রাসসুন্দরী দেবীর আত্মজীবনীতেও এরূপ চিত্র পাওয়া যায়। তিনি পরিবার বা সম্পর্ক নিয়ে বেশি আলোকপাত করেন নি; একদম ঠিক। তবে তিনি কখনই পরিবারের বিরোধিতা, সমালোচনাও করেন নি। বরং স্বামীর প্রতি সম্মান^{ix}, শ্বশুরজীর প্রশংসা, ননদেরও প্রশংসা করতে দেখা যায়।^x সন্তানদের নিয়েও তিনি বলেছেন “বস্তুতঃ সন্তান হইতে মাতাপিতার যেমন নানা প্রকার যত্নণা ভোগ করিতে হয়, মনুষ্যকে এত যত্নণা আর কিছুতেই ভোগ করিতে হয় না। বস্তুতঃ পিতার অপেক্ষা এ বিষয়ে মাতার যত্নণাই বেশী। কিন্তু জগদীশ্বর সদয় হইয়া এ বিষয়ে আমাকে কোন কষ্টই দেন নাই। আমার পুত্রকন্যায় যে কয়েকটি সন্তান হইয়াছিল, তাহারা সকলেই একমত হইয়াছিল। তাহারা সকলেই সুন্দর, সচ্চরিত্র, বিদ্বান, দাতা, দয়াবান, ধার্মিক এবং কখনও গর্হিত কর্ম করিত না। উহাদের চরিত্র বিষয়ে আমাকে কোন কষ্ট পাইতে হয় না।”^{৩৫} তাঁর সন্তানদের অনেকেই সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন, এমন কি তাঁর নাতি, নাতিনিরাও খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর নাতি সরলাবালা সরকারের রচনা থেকে জানা যায়, “হাইকোর্টের উকিল কিশোরীলাল সরকার, যিনি ‘ঠাকুর ল’, লেকচারার ছিলেন এবং ‘এ ডাইং রেস, হাউ ডাইং’, ‘হিন্দু সিস্টেম অব মরাল সায়েন্স’, ‘হিন্দু সিস্টেম অব রিলিজিয়াস সায়েন্স’, ‘হিন্দু সিস্টেম অব সেল্ফ কালচার’ প্রভৃতি পুস্তক লিখিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার এক পুত্র।

আর এক পুত্র রায়বাহাদুর দ্বারকানাথ সরকার কৃষ্ণনগরের ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। তাঁহার পৌত্রেরা সকলেই কৃতবিদ্য। সুপ্রসিদ্ধ মনস্তত্ত্ববিদ ডাক্তার সরসীলাল সরকার তাঁহার এক পৌত্র।^{১৩৬} পরিবারে প্রতি তাঁর কোন অনুযোগ বা অভিযোগ ছিল না। সমাজে প্রচলিত রীতি-নীতির দ্বারা পরিচালিত হতো পরিবার সে কথা হয়তো তিনি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। তাই আত্মজীবনী ‘আমার জীবন’এ পরিবারের সদস্যদের প্রতি অনুযোগ নয়, অভিযোগ নয়; বরং সমাজে প্রচলিত রীতিনীতি দ্বারা নারীরা বঞ্চিত, সেই চিত্রটিই তিনি তুলে ধরেছেন। তাঁর আত্মজীবনীতে দেখতে পাওয়া যায় যে, তিনি যেন মনে করেছিলেন কোন কাজ করতে গেলে পরিবারের মধ্যে থেকেই তাঁকে করতে হবে, পরিবার থেকে বেরিয়ে গিয়ে নয়। পরিবারের প্রত্যেকটি সদস্যদের প্রতি তাঁর ছিল যত্ন ও দরদের সম্পর্ক। পরিবারের প্রতি কাজে ছিল নিষ্ঠা। পরিবারের কোন সম্পর্ক থেকে নিষ্কাশিত হয়ে কোন পরিবর্তন নয়, বরং পরিবারের মধ্যে থেকেই পরিবর্তন আনতে হবে। “গিলিগানের মতে এই পার্থক্য সামাজিক কারণে হয়ে থাকে। সামাজিক ভূমিকা এমনভাবে নিরূপিত হয়েছে যে মেয়েরা সাহস পায় না ‘এক্সিট’ বা নিষ্ক্রমণের বিকল্প বেছে নিতে। তারা নানা সম্পর্কে সামাজিক কারণে সম্বন্ধ এবং পরবর্তীকালেও তারা মুক্তির পথ খোঁজে সম্বন্ধের ভেতরে থেকেই, সম্বন্ধকে বাতিল করে বেরিয়ে গিয়ে নয়।”^{১৩৭} একদম ঠিক, রাসসুন্দরী দেবীর লড়াই পরিবারের মধ্যে থেকেই। বিবাহের পর খাঁচায় বন্দী পাখি হিসাবে শৃঙ্খলবাড়িতে বসবাস করলেও, তিনি (এক্সিট করেন নি) বেরিয়ে যান নি। ‘ভয়েস’ এর বিকল্পটি যেন তিনি গ্রহণ করেছিলেন। তার ফলস্বরূপ পরিস্থিতি পরবর্তী সময়ে অনেকটাই নিজ অনুকূলে আসে। পরিবারের মধ্যে থেকে মুক্তির স্বাদ তিনি পেয়েছিলেন কি না, তা স্পষ্টরূপে না বলা গেলেও এ কথা বলাই যায় যে শেষের দিকে পরিবারের মধ্যে কতী হয়েছিলেন। কর্তৃত্বপে তিনি স্বাধীনতা কিছুটা হলেও ভোগ করেছেন। তাই তো ‘আত্মজীবনী’ রচনার কিছুদিনের মধ্যে তাঁর সপ্তম পুত্র কিশোরীলাল বই প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। আবার দ্বিতীয় খন্ডটি কিশোরীলালের পুত্র সরসীলাল প্রকাশ করার ব্যবস্থা করেন। বাংলা ভাষাতে প্রথম ‘আত্মজীবনী’ প্রকাশ করার ক্ষেত্রে একজন গ্রাম্য সাধারণ নারী হিসাবে কোন বাধা আসে নি। এছাড়া রাসসুন্দরী দেবীর পরবর্তী প্রজন্ম দিকে তাকালে বোঝা যায় যে তিনি পরিবর্তনের এক স্রোত তাঁর পরিবারের মধ্যে অবশ্যই আনতে সক্ষম হয়েছিলেন আর এখানেই তাঁর ‘আত্ম’ হয়ে ওঠার চরম সার্থকতা।

- i “১২১৬ সালে চৈত্র মাসে আমার জন্ম হয়” — “আমার জীবন”, শ্রীমতি রাসসুন্দরী দেবী, পৃ ২
- ii “চারি বৎসরের সময়ে আমার পিতার মৃত্যু হইয়াছে” “আমার জীবন”, পৃ ৮
- iii “ঐ বার বৎসরে আমার বিবাহ হয়”। আমার জীবন, পৃ ১৭
- iv “১২৭৫ সালে ২৯ মাঘী শিবচতুর্দশির দিবসে, আড়াই প্রহর বেলার সময় কর্তাটির মৃত্যু হয়।” (আমার জীবন, পৃ ৬৯)
১২৭৫ সালের ২৯শে মাঘ = ১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারী
- v “তখনও আমি গোপনে গোপনে কাঁদিতাম বটে, কিন্তু তাঁহাদের নিকট সকল দিন থাকিতে থাকিতে তাঁহাদের পোষা পাখী হইয়া তাঁহাদের শরণাগত হইলাম”। (আমার জীবন, পৃ ২৬)
- vi “Not only did she learn to read, but she also decided to record the events and details of her everyday domestic life in a book and got it published. She had the audacity to disclose her life in print. By doing this, she entered the public sphere which was strictly forbidden to upper class Hindu women. A published work no longer remains a private act of writing

but enters the public domain where it is open and available for perusal and interrogation by anyone.” Hira Naaz, ‘The Caged Bird Who Sang : The Life and Writing of Rassundari Devi.’

- vii “মন নামক অন্তরীন্দ্রিয়টি সকল ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্ত্রক”। (শর্মিষ্ঠা ঘোষ, প্রবন্ধ—মনই সমাজের মস্তিষ্ক, ইরাবতী, ১৭ই ফেব্রুয়ারী ২০২৩, <https://irabotee.com/%E0%A6%AE%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0/>)
- viii কোহলবার্গ যে ৩টি স্তরের কথা বলেছেন, প্রত্যেকটি স্তর আবার ২টি ভাগে বিভক্ত। প্রথম স্তর প্রথাগত স্তরে—Punishment and obedience বা Might makes right ও Instrumentalism বা look out for number one। প্রচলিত স্তরের প্রথমটি বা তৃতীয় পর্বটি হল Interpersonal relationships। চতুর্থ পর্বটি হল “Maintaining social conventions or ‘law and order’ are brief but apt descriptions of the fourth stage. This sense of order becomes generalized beyond close others to society at large.” (‘Piaget, Kohlberg, Gilligan and others on Moral Development,’ Copyright 2005, 2006, J.S.Fleming, PhD, p 9) পঞ্চম পর্ব (উত্তর প্রচলিত স্তরের প্রথম পর্ব) হল Social contract stage (“The understanding is that laws, rules and regulations are created for the mutual benefit of all citizens.”) এবং ষষ্ঠ পর্ব হল Universal ethical principle (“Right and wrong are not determined by rules and laws, but by individual reflection on what is proper behavior”).
- ix “তিনি অতি উত্তম লোক ছিলেন। তেমন একটি লোক বড় দেখা যায় না”। (আমার জীবন, পৃ ৮৯)
- x “বাস্তবিক ননদে যে ভাইজকে এত স্নেহ করে, এ প্রকার কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না”। (পৃ ৪৮)

তথ্যসূত্র :

- ১) রায়, রামমোহন। ১৯১৮। সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক নিবর্তকের দ্বিতীয় সংবাদ, রামমোহন গ্রন্থাবলী ২য় খন্ড, সম্পাদক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, পৃ ৪৬
- ২) গোলাম মুরশিদ। ১৯৯৩। রাসসুন্দরী থেকে রোকেয়া নারী প্রগতির একশো বছর, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ ১০
- ৩) সরকার, সরলাবালা। ১৯৮৯। রচনা সংগ্রহ, প্রথম খন্ড, চিত্রা দেব সম্পাদিত, আনন্দ পার্বলিশার্স, পৃ ৭৩৭
- ৪) ভট্টাচার্য, সুতপা। ২০১৮। মেয়েদের স্মৃতিকথা, সিগারেট প্রেস, পৃ ২
- ৫) শ্রীমতি রাসসুন্দরী দেবী। ১৯৫৯। আমার জীবন, দে বুক স্টোর, কলিকাতা, পৃ ৬
- ৬) ঐ, পৃ ৬
- ৭) ঐ, পৃ ২০
- ৮) ঐ, পৃ ৩৪
- ৯) ঐ, পৃ ৪৫
- ১০) ঐ, পৃ ৬৫
- ১১) গোলাম মুরশিদ, ১৯৫৯। রাসসুন্দরী থেকে রোকেয়া : নারীপ্রগতির একশ বছর, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ ৩৪
- ১২) রাসসুন্দরী দেবী, ১৯৫৯। আমার জীবন, দে বুক স্টোর, কলিকাতা, পৃ ৯৬
- ১৩) সিংহ, ডঃ মঞ্জুশ্রী। ২০০০। ঊনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে বঙ্গমহিলা, শাল্মলী পাবলিকেশন, পৃ ২০৯
- ১৪) চক্রবর্তী, সম্ভুদ্র। ১৯৯৫। অন্দরে অন্তরে ঊনিশ শতকে বাঙালি ভদ্রমহিলা, স্ত্রী পাবলিকেশন, কলিকাতা ২৬, পৃ ৪৬
- ১৫) রবীন্দ্ররচনাবলী, দশম খন্ড, ১৩৯৬, বিশ্বভারতী, কলিকাতা ১৭, পৃ ১৫০

- ১৬) শ্রীমতি কৈলাসবাসিনী দেবী, ১৭৮৫ শক। হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা, গুপ্ত যন্ত্রে মুদ্রিত, কলিকাতা, পৃ ৬
- ১৭) রাসসুন্দরী দেবী। ১৯৫৯। আমার জীবন, দে বুক স্টোর, কলকাতা, পৃ ২
- ১৮) ভট্টাচার্য, সুতপা। ২০১৮। মেয়েদের স্মৃতিকথা, সিগরেট প্রেস, পৃ ১০
- ১৯) রাসসুন্দরী দেবী। ১৯৫৯। আমার জীবন, দে বুক স্টোর, পৃ ২০
- ২০) রাসসুন্দরী দেবী, আমার জীবন, পৃ ৩৮
- ২১) ঐ, পৃ ৩৮
- ২২) ঐ, পৃ ২৯
- ২৩) ভট্টাচার্য, সুতপা। ২০১৮। মেয়েদের স্মৃতিকথা, সিগরেট প্রেস, পৃ ৯
- ২৪) রাসসুন্দরী দেবী, আমার জীবন, পৃ ৩৩
- ২৫) ঐ পৃ ৪৫
- ২৬) রাসসুন্দরী দেবী। ১৯৫৯। আমার জীবন, দে বুক স্টোর, ভূমিকা, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
- ২৭) গোলাম মুরশিদ। ১৯৯৩। রাসসুন্দরী থেকে রোকেয়া : নারী প্রগতির একশো বছর, বাংলা একাডেমী ঢাকা, পৃ ১৭
- ২৮) রাসসুন্দরী দেবী। ১৯৫৯। আমার জীবন, দে বুক স্টোর, কলকাতা, পৃ ৪৯
- ২৯) Hira Naaz, 2017. 'The Caged Bird Who Sang : The Life and Writing of Rassundari Devi', March, Feminism in India
- ৩০) ডঃ জোসেফ মারফি, দ্য পাওয়ার অব ইউর সাবকনশাস মাইন্ড, অনুবাদক অনীশ দাস অপু, ২০১৫, মুক্তদেশ প্রকাশন ঢাকা ১১০০, পৃ ৪৪
- ৩১) স্বামী বিবেকানন্দ বাণী ও রচনা, তৃতীয় খন্ড, ১৯৭৫, উদ্বোধন কার্যালয়, পৃ ৩৯৯
- ৩২) Carol Gilligan, 1993. In a different voice : psychological theory and women's development, Harvard University Press, p 18
- ৩৩) 1993. In a different Voice : psychological theory and women's development, Harvard University Press, p 18
- ৩৪) মৈত্র, শেফালী। ২০০৭। নৈতিকতা ও নারীবাদ, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃ ১৩৫
- ৩৫) রাসসুন্দরী দেবী, ১৯৫৯। আমার জীবন, দে বুক স্টোর, কলকাতা, পৃ ৫১
- ৩৬) সরকার, সরলাবালা। ১৯৮৯। রচনাসংগ্রহ ২য় খন্ড, চিত্রা দেব সম্পাদিত, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃ ৬৩৩
- ৩৭) মৈত্র, শেফালী। ২০০৭। নৈতিকতা ও নারীবাদ, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃ ১৩৬

লেখক পরিচিতি

দর্শন বিভাগ

ফকির চাঁদ কলেজ

ইমেল : sharmibasud2010@gmail.com